হামচুপামু হাফ্

ও

রবীন্দ্রনাথ

পাঁচুগোপাল বক্সি

পুনশ্চ

বেশ পরিপাটি করে বীজতলা বানিয়ে উন্নতমানের বীজ বপন ও যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করা হলে স্বাস্থ্যবান চারাগাছ জন্মায়। উর্বর জমিতে সে-গাছ রোপণ করে নিয়মিত পরিচর্যা করলে ভালো ফসল ফলতে পারে। রবীন্দ্রনাথের হয়ে ওঠার পিছনে বীজতলা ও উর্বর জমির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বীজতলা হল তাঁর পারিবারিক পরিবেশ আর উর্বর জমি হল সমকালীন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি। তাঁর জীবনদর্শন ও কবিচেতনা গড়া বা সমস্ত জীবনের সৃষ্টি ও কর্মের যা কিছু নিত্যফলরূপ সোনার ধানে তরী বোঝাই করার ক্ষেত্রে এই দুয়ের অবদান অনস্বীকার্য।

উনিশ শতকে আধুনিকতার সূত্রপাতের অব্যবহিত পূর্বে অন্যান্য বাঙালি পরিবারের মতো জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারও নানা আচার-বিচার, প্রাচীন সমাজের সংস্কার মেনে চলত। এই বাড়ির মহিলারা ছিলেন পর্দানশিন। তাঁদের কাছে ঘর যদি হয় অমাবস্যা, তবে বাইরেটা যেন পূর্ণিমা। তাঁরা ঘেরাটোপ-দেওয়া পালকি চড়ে গঙ্গাস্নানে যেতেন। কিন্তু ঘাটে নামার রেওয়াজ ছিল না। বন্ধ পালকিসমেত তাঁদের জলে চুবিয়ে আনা হত। ব্যাবসা-বাণিজ্য বা প্রশাসনিক কাজের সুবাদে রাজকর্মচারীদের সঙ্গে মেলামেশার কারণে অন্যান্য অভিজাত পরিবারের মতো ঠাকুর-বাড়ির পুরুষেরাও পোশাকে-পরিচ্ছদে, আদব-কায়দায় ছিলেন আধা-মোগলাই। সেকালে রাজা মহারাজা দেওয়ান অনেক ছিলেন; কিন্তু বিলাতে লোক এক ভারতীয়র দানখয়রাত দেখে তাঁকে 'প্রিন্স' বলত। তিনি দ্বারকানাথ (১৭৯৪-১৮৪৬)। নানা ধরনের ব্যাবসা-বাণিজ্য করে তিনি যেমন দু-হাতে রোজগার করেছেন; তেমনি আপন শখ বিলাসিতা মেটাতে দেদার খরচ করেছেন। ঘর সাজিয়েছেন বিলাতি সোফা-কৌচ, টেবিল-চেয়ার প্রভৃতি আসবাবপত্র, ছবি, ইতালীয় পাথরের মূর্তি প্রভৃতি দিয়ে। এইভাবে ইউরোপীয় আধুনিকতার হাওয়া ঢুকল ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে।

দ্বারকানাথ ব্যাবসা বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধার সন্ধানে বা ভ্রমণের নেশায় ইংল্যান্ড যান; বেলগাছিয়ার বাগানবাড়ির জলসায় ইংরেজ রাজপুরুষ বণিক মেম ও বিশিষ্ট বাঙালিদের খানাপিনা নাচ-গানের এলাহি আয়োজন করতেন। তবে, সাহেবিয়ানা করলেও তিনি সাহেবি পোশাক-পরিচ্ছদ কখনও পরেননি বা রামমোহন রায়ের (১৭৭৪—১৮৩৩) সঙ্গে বন্ধুত্বের কারণে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেননি; হিন্দুধর্মের আচার-অনুষ্ঠান, লোকাচার ত্যাগ করেননি।

দ্বারকানাথের আভিজাত্যের অনুষঙ্গে, সম্ভোগের উপচার হিসেবে আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছিল ঠাকুরবাড়ির বহিরঙ্গে। দেবেন্দ্রনাথ (১৮১৭-১৯০৫) তার পরিশীলিত রূপটিকে প্রতিষ্ঠা করলেন পারিবারিক প্রতিবেশের অন্তরঙ্গে। করলেন বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে--

ব্রাহ্মধর্মগ্রহণ (২২ ডিসেম্বর, ১৮৪৩) ও বাড়িতে অনুষ্ঠানসর্বস্ব পুজোর ঘটা বন্ধ করা, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা সংস্কৃতির সমন্বয় সাধন, ভারতবর্ষের নিসর্গলোক, হিমালয়ের সৌন্দর্য ও মহিমা, এদেশের ঐতিহ্য সনাতন ধর্মাদর্শ প্রভৃতি সম্পর্কে অনুরাগ, সন্তানদের মুক্তচিন্তা ও প্রজ্ঞা লাভে সহায়তা দান ইত্যাদি। মহর্ষি স্বয়ং যেমন উপনিষদ, গীতগোবিন্দ, হাফিজের কবিতার পাশাপাশি গিবনের (Edward Gibbon) বিপুলাকার বই (The History of the Decline and Fall of the Roman Empire) প্রভৃতি পড়তেন; আদিব্রাহ্মসমাজের মন্দিরে বিলাতি পাইপ-অর্গ্যান বাদন অনুমোদন করেন; তেমনি বালক রবীন্দ্রনাথকে বাংলা ও সংস্কৃত পড়ানোর পাশাপাশি Peter Parley's Tales পর্যায়ের গ্রন্থাবলি, প্রক্টর (Richd. A Proctor)-এর লেখা জ্যোতিষগ্রন্থ ইত্যাদি থেকে অনেক বিষয় বুঝিয়ে দিতেন এবং বাড়িতে কাব্য, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, জ্যামিতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি পড়ার পাশাপাশি নিয়মিত ড্রয়িং, জিমনাস্টিকস, কুস্তি, গান প্রভৃতি চর্চার ব্যবস্থা করেন। স্বামী বিবেকানন্দের মতো রবীন্দ্রনাথ-ও হিমালয়ের মৌনমুখর সৌন্দর্যে মহিমায় বিমুগ্ধ। মহর্ষির সঙ্গে ডালহৌসি পাহাড় ভ্রমণকালেই কবির অন্তরে জাগে হিমালয় প্রীতি। সন্ধ্যায় ডাকবাংলার বাইরে চৌকিতে মহর্ষি বালকপুত্রটিকে পাশে বসিয়ে পর্বতের স্বচ্ছ আকাশে আশ্চর্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠা গ্রহ নক্ষত্র চিনিয়ে দিয়ে জ্যোতিষ্ক সম্বন্ধে আলোচনা করতেন। সূর্যোদয়কালে আপন উপাসনা ও দুধ পান সাঙ্গ হলে মহর্ষি রবীন্দ্রনাথকে পাশে নিয়ে দাঁড়িয়ে উপনিষদের মন্ত্রপাঠ দ্বারা আর একবার উপাসনা করতেন। রাজনারায়ণ বসুকে লেখা (২৫ এপ্রিল, ১৮৭৩) পত্রে মহর্ষি অমৃতসর থেকে তাঁর প্রিয় বক্রোটাশেখরে পৌছানোর সংবাদ দিয়ে লিখেছেন, 'রবীন্দ্র এখানে ভালো আছে এবং আমার নিকটে সংস্কৃত ও ইংরাজি অল্প অল্প পাঠ শিখিতেছে। ইহাকে ব্রাহ্মধর্মও পড়াইয়া থাকি।'

জননী সারদাদেবী বিরাট পরিবারের কর্ত্রী হিসেবে সাংসারিক নানা কাজে ব্যস্ত থাকতেন এবং শেষ সন্তান বুধেন্দ্রনাথ (১৮৬৩-১৮৬৪) ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকে তাঁর শরীর ভেঙে যায়। বছর চোদ্দো বয়সে রবীন্দ্রনাথ মাকে হারান। ভৃত্য মহলে অযত্নে অনাদরে প্রতিপালিত ও মাতৃসান্নিধ্য বঞ্চিত বালকের জীবনে স্বাভাবিকভাবেই মায়ের তুলনায় বাবার প্রভাব পড়েছে অনেক বেশি। তিনি দেখেছেন তাঁর পিতামহের বিপুল ঋণ তাঁর পিতৃদেব কীভাবে সুতীক্ষ্ণ বৈষয়িক বুদ্ধিবলে ও মিতব্যয়ের দ্বারা পরিশোধ করেন এবং বিষয়সম্পত্তি গড়ে তুলে জমিদারির বিপুল আয়ের বন্দোবস্ত করেন। তিনি পিতৃদেবের অসাধারণ স্মরণশক্তি ও ধারণাশক্তির উল্লেখ করেছেন (দ্র. হিমালয়যাত্রা, জীবনস্মৃতি) এবং তাঁর শৃঙ্খলাপরায়ণতা, কর্তব্যচেতনা, প্রতিটি কাজে নিষ্ঠা ও পারিপাট্যের প্রশংসা করে মন্তব্য করেছেন, 'আমাদের জাতিগত স্বভাবটা যথেষ্ট ঢিলাঢালা।...এ-সম্বন্ধে আমাদের দেশের জাতিগত ধর্ম তাঁহার একেবারেই ছিল না। তাঁহার সংকল্পে, চিন্তায়, আচরণে ও অনুষ্ঠানে তিলমাত্র শৈথিল্য ঘটিবার উপায় থাকিত না। এইজন্য হিমালয় যাত্রায় তাঁহার কাছে যতদিন ছিলাম, একদিকে আমার প্রচুর পরিমাণে স্বাধীনতা ছিল, অন্য দিকে সমস্ত আচরণ অলঙ্ঘ্যরূপে নির্দিষ্ট ছিল।

যেখানে তিনি ছুটি দিতেন সেখানে তিনি কোনো কারণে কোনো বাধাই দিতেন না, যেখানে তিনি নিয়ম বাঁধিতেন সেখানে তিনি লেশমাত্র ছিদ্র রাখিতেন না।'

মহর্ষি হিমালয় ভ্রমণকালে প্রচুর টাকাভরতি ক্যাশবাক্সটি বালক রবীন্দ্রনাথের হেপাজতে রেখে তাঁকে দায়িত্বভার গ্রহণের প্রশিক্ষণ দেন। বরফগলা ঠান্ডা জলে স্নান করিয়ে তাঁর সহনশীলতা বাড়াতে চান।

যৌবনাগমে এক সময় কবির গোরুর গাড়িতে করে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে পেশোয়ার পর্যন্ত যাওয়ার ইচ্ছা জাগলে মহর্ষি বাদে সবাই আপত্তি করেন। দেবেন্দ্রনাথ পদব্রজে ও ঘোড়ার গাড়ি প্রভৃতি বাহনে আপন ভ্রমণের অভিজ্ঞতা শোনান এবং ভ্রমণকালে কষ্ট বা বিপদের সম্ভাবনার কথা না তুলে তিনি পুত্রকে ভ্রমণে উৎসাহ জোগান।

আদি ব্রাহ্মসমাজের সেক্রেটারি পদে নিযুক্ত হয়ে (১৮৮৪) রবীন্দ্রনাথ সমাজের বেদিতে অব্রাহ্মণকেও আচার্য রূপে বসানোর প্রস্তাব দিলে মহর্ষি বাধা দেননি।

মহর্ষি তাঁর এই চতুর্দশ সন্তানটিকে এদেশের বা বিদেশের প্রথানুগ শিক্ষা গ্রহণে বাধ্য করেননি; আপন অভিমত তাঁর ওপর চাপিয়ে দেননি বরং ধৈর্যের সঙ্গে পুত্রের কথা শুনে যুক্তি সহকারে তাঁর ভুলত্রুটি সংশোধন করে দিতেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অনেক কৌতুকের গল্প করতেন। চিঠি লেখার কায়দাকানুন শিখিয়ে দিতেন।

উক্ত স্মৃতিচারণায় কবি তাঁর পিতৃদেব সম্বন্ধে লিখেছেন, 'তাঁহার জীবনের শেষ পর্যন্ত ইহা দেখিয়াছি, তিনি কোনোমতেই আমাদের স্বাতন্ত্র্যে বাধা দিতে চাহিতেন না। তাঁহার রুচি ও মতের বিরুদ্ধে কাজ অনেক করিয়াছি; তিনি ইচ্ছা করিলেই শাসন করিয়া তাহার নিবারণ করিতে পারিতেন, কিন্তু কখনো তাহা করেন নাই। যাহা কর্তব্য তাহা আমরা অন্তরের সঙ্গে করিব, এজন্য তিনি অপেক্ষা করিতেন। সত্যকে এবং শোভনকে আমরা বাহিরের দিক হইতে লইব, ইহাতে তাঁহার মন তৃপ্তি পাইত না; তিনি জানিতেন, সত্যকে ভালোবাসিতে না পারিলে সত্যকে গ্রহণ করাই হয় না। তিনি ইহাও জানিতেন যে, সত্য হইতে দূরে গেলেও একদিন ফেরা যায়, কিন্তু কৃত্রিম শাসনে সত্যকে অগত্যা অথবা অন্ধভাবে মানিয়া লইলে সত্যের মধ্যে ফিরিবার পথ রুদ্ধ করা হয়।

'...যেমন করিয়া তিনি পাহাড়ে পর্বতে আমাকে একলা বেড়াইতে দিয়াছেন, সত্যের পথেও তেমনি করিয়া চিরদিন তিনি আপন গম্যস্থান নির্ণয় করিবার স্বাধীনতা দিয়াছেন। ভুল করিব বলিয়া তিনি ভয় পান নাই, কষ্ট পাইব বলিয়া তিনি উদ্বিগ্ন হন নাই। তিনি আমাদের সম্মুখে জীবনের আদর্শ ধরিয়াছিলেন, কিন্তু শাসনের দণ্ড উদ্যত করেন নাই।'

মহর্ষির জীবনে ৭ পৌষ পরম পুণ্যদিন যেদিন তিনি লাভ করেছিলেন সত্যধর্মকে। এই পবিত্র দিনটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন, 'একদিন যাঁর চেতনা বিলাসের আরামশয্যা থেকে হঠাৎ জেগে উঠেছিল, এই ৭ই পৌষ দিনটি সেই দেবেন্দ্রনাথের দিন।... আজকের এই ৭ই পৌষের মাঝখানে তাঁর সেই সত্যদীক্ষার রুদ্রদীপ্তি এবং বরাভয়রূপ দুইই রয়েছে—সেটি যদি আমরা দেখতে পাই এবং লেশমাত্রও গ্রহণ করতে পারি তবে ধন্য হব।...

'সেই সাধু সাধক তাঁর জীবনের সকলের চেয়ে বড়ো দিনটিকে, তাঁর দীক্ষার দিনটিকে, এই নির্জন প্রান্তরের মুক্ত আকাশ ও নির্মল আলোকের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে রেখে দিয়ে গেছেন। তাঁর সেই মহাদিনটির চারিদিকে এই মন্দির, এই আশ্রম, এই বিদ্যালয় প্রতিদিন আকার ধারণ করে উঠছে; আমাদের জীবন, আমাদের কল্যাণ মূর্তিমান হয়ে এখানে আবির্ভূত হয়েছে; এবং তাঁর সেই সত্যদীক্ষার দিনটি ধনী ও দরিদ্রকে, বালক ও বৃদ্ধকে, জ্ঞানী ও মূর্খকে বর্ষে বর্ষে আনন্দ-উৎসবে আমন্ত্রণ করে আনছে।...'

মহর্ষিকে কবি 'দীক্ষাদাতা', 'গুরু' বলে সম্বোধন (দ্র. 'দীক্ষা', শান্তিনিকেতন) করেছেন এবং সত্যধর্ম আশ্রয় করে পিতৃদেহের মতো তিনিও জগতের আনন্দরূপটি বিশ্বেশ্বরের অফুরান প্রেমের জগদ্ব্যাপী মহোৎসবটি উপলব্ধি করবার সদাজাগ্রত চেতনা লাভ করেছেন; শোক তাপ দুর্দিনের দারুণ আঘাতে অচঞ্চল থাকেন।

দেবেন্দ্রনাথ ভারতীয় বিভিন্ন শাস্ত্র থেকে সারকথা সংকলন করে আপন ধর্মবিশ্বাস ব্যক্ত করেন 'ব্রাহ্মধর্ম' নামক গ্রন্থে। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 'এই ব্রাহ্মধর্ম বইখানি যে কেবল হিন্দুর ধর্মচিন্তার উৎকৃষ্ট সংগ্রহ পুস্তক তা নয়, বিশ্বধর্মের ভূমিকারূপেও তাকে গ্রহণ করতে কারো বাধা না হতে পারে।

'...ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থটি ছিল কবির নিত্যসঙ্গী, তাঁর সাধকজীবনের আশ্রয়— সেখান থেকে পেতেন তাঁর অধ্যাত্মজীবনের শক্তি ও সম্বল, আনন্দ ও বীর্য।'

দেখা যাচ্ছে, কবিচেতনায় বাস্তবমনস্কতা ও আধ্যাত্মিকতার, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাবধারার সমন্বয়, তাঁর সর্বানুভূতি ও আনন্দবাদ, নিসর্গপ্রীতি, উদারদৃষ্টি, ব্যক্তিত্ব প্রভৃতিতে মহর্ষির বিশেষ প্রভাব পড়েছিল।

দ্বারকানাথের আপত্তি সত্ত্বেও দেবেন্দ্রনাথ তাঁর পিতৃবন্ধু রামমোহন রায় প্রবর্তিত একেশ্বরবাদী ধর্ম গ্রহণ করেন এবং তার পর থেকেই ঠাকুর পরিবারে অন্ধ সংস্কার বিশ্বাস যান্ত্রিক অভ্যাস বর্জনের ভেতর দিয়ে যুগান্তর ঘটে। কবি লিখেছেন, 'আমাদের পরিবার আমার জন্মের পূর্বেই সমাজের নোঙর তুলে দূরে বাঁধাঘাটের বাইরে এসে ভিড়েছিল।'

প্রায় পূর্বসংস্কারহীন পারিবারিক পরিবেশে লালিত হন রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর দাদারা। বড়দা দ্বিজেন্দ্রনাথ (১৮৪০-১৯২৬) 'স্বপ্নপ্রয়াণ' (১৮৭৫) লিখে বন্ধুদের পড়ে শোনাতেন আর বালক রবীন্দ্রনাথ দরজার পাশে দাঁড়িয়ে তা সাগ্রহে শুনে স্মৃতিপটে গচ্ছিত রাখেন। স্পেন্সারের (Edmund Spenser, 1552-99) 'The Faerie Queene'-এর আদলে রচিত এই বাতিক্রমী ও অনন্যসাধারণ কাব্যটির অতীন্দ্রিয় রহস্য, সৌন্দর্যসৃষ্টি, রূপকথা, রূপক, রোমান্টিক কল্পনায় আঁকা চিত্রকল্প ইত্যাদি তাঁকে মুগ্ধ করে। এই আখ্যানকাব্যটি সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, 'আমারও এই কাব্য খুব ভালো লাগিত। বিশেষত, আমরা এই কাব্যের রচনা ও আলোচনার হাওয়ার মধ্যেই ছিলাম, তাই ইহার সৌন্দর্য সহজেই আমার হৃদয়ের তন্তুতে তন্তুতে জড়িত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এই কাব্য আমার অনুকরণের অতীত ছিল। কখনো মনেও হয় নাই, এই রকমের কিছু-একটা আমি লিখিয়া তুলিব।

'স্বপ্নপ্রয়াণ যেন একটা রূপকের অপরূপ রাজপ্রাসাদ . তাহার কতরকমের কক্ষ গবাক্ষ চিত্র মূর্তি ও কারুনৈপুণ্য। ...ইহার মধ্যে কেবল ভাবের প্রাচুর্য নহে, রচনার বিপুল বিচিত্রতা আছে।' (সাহিত্যের সঙ্গী, জীবনস্মৃতি)

কৈশোরকালে রচিত রবীন্দ্রনাথের আখ্যানকাব্যগুলিতে 'উদাসিনী' (১৮৭৪), 'ভারত-গাথা' (১৮৯৫) নামক সেকালে জনপ্রিয় কাব্যের কবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী (১৮৫০-১৮৯৮), 'চিত্তমুকুর' (১৮৭৮), 'বাসন্তী' (১৮৮০), 'যোগেশ' (১৮৮০) ও 'চিন্তা' (১৮৮৭) কাব্য রচয়িতা ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫৬-১৮৯৭) বা 'বঙ্গসুন্দরী' (১৮৭০), 'নিসর্গ সন্দর্শন' (১৮৭০), 'বন্ধুবিয়োগ' (১৮৭০), 'প্রেমপ্রবাহিনী' (১৮৭১), 'সারদামঙ্গল' (১৮৭৯), 'সাধের আসন' (বাংলা ১২৯৫-৯৬ সাল) ইত্যাদি কাব্যের রচয়িতা তথা রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক তাঁর কাব্যগুরু ও 'ভোরের পাখি' অভিধায় ভূষিত বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫- ১৮৯৪)-র মতোই দ্বিজেন্দ্রনাথের-ও প্রভাব স্পষ্ট।

কবির মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ (১৮৪২-১৯২৩) ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম আই সি এস। ইংল্যান্ড থেকে ফিরে এসে তিনি দৃষ্টিভঙ্গি, চাল-চলনে বিলাতিয়ানা আমদানি করেন; অবরোধ প্রথা থেকে নারীজাতির মুক্তি ও কন্যাসন্তানদের উপযুক্ত শিক্ষাদানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে কর্মস্থল মুম্বাই থেকে সত্যেন্দ্রনাথ ইউরোপীয় পোশাক পরিহিতা স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনীদেবীকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফেরার দৃশ্যটির স্মৃতিরোমন্থন প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন, 'ঘরের বউকে মেমের মতো গাড়ি হইতে সদরে নামিতে দেখিয়া সেদিন বাড়িতে যে শোকাভিনয় ঘটিয়াছিল তাহা বর্ণনার অতীত।' সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাবে কবির জ্যোতিদাদা তাঁর পত্নী কাদম্বরী দেবীকে ঘোড়ায় চড়িয়ে, নিজে আর একটা ঘোড়ায় চড়ে গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে যেতেন। লোকনিন্দা কানে তুলতেন না।

কবির সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ (১৮৪৪-১৮৮৪) বিশ্বাস করতেন, বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞানে বালকদের মন ভরে দেওয়া হলে তাদের চিত্তের 'সর্বোদয়' হবে। এই কারণে স্কুলের প্রথাগত শিক্ষা ছাড়াও বাড়িতে বালকদের নানা বিষয় চর্চার ব্যবস্থা করা হয়। বাংলাভাষার মাধ্যমে শিক্ষা লাভের সুযোগ থাকায় শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষার ভিতটা পাকা হয়ে যায়।

কবি তাঁর জীবনে জ্যোতিদাদা (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ১৮৪৯-১৯২৫)-র প্রভাব সম্পর্কে লিখেছেন, 'সাহিত্যের শিক্ষায়, ভাবের চর্চায়, বাল্যকাল হইতে জ্যোতিদাদা আমার প্রধান সহায় ছিলেন। তিনি নিজে উৎসাহী এবং অন্যকে উৎসাহ দিতে তাঁহার আনন্দ। আমি অবাধে তাঁহার সঙ্গে ভাবের ও জ্ঞানের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতাম। তিনি বালক বলিয়া আমাকে অবজ্ঞা করিতেন না।

'তিনি আমাকে খুব একটা বড়োরকমের স্বাধীনতা দিয়াছিলেন; তাঁহার সংস্রবে আমার ভিতরকার সংকোচ ঘুচিয়া গিয়াছিল।... জ্যোতিদাদাই সম্পূর্ণ নিঃসংকোচে সমস্ত ভালোমন্দর মধ্য দিয়া আমাকে আমার আত্মোপলব্ধির ক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং তখন হইতেই আমার আপন শক্তি নিজের কাঁটা ও নিজের ফুল বিকাশ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারিয়াছে।...